পার্বত্যাঞ্চলে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠায় পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের বিকল্প নেই

মঙ্গল কুমার চাকমা

“পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের প্রতিশ্রুতি ও জনগণের প্রত্যাশা” শীর্ষক সেমিনার

এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভলপমেন্ট এবং কাপেইং ফাউন্ডেশন
৩১ মার্চ ২০০৯, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে পার্বত্যাঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকার করে এই অঞ্চলের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা, জুম্ম জনগণের প্রথাগত ভূমি অধিকারকে স্বীকার করে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা, গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে (বিডিআর ক্যাম্প ও ৬টি স্থায়ী সেনানিবাস ব্যতীত) সশস্ত্রবাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা, এই অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত একটি মন্ত্রণালয় গঠন করার বিধান করা হয়। সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ (স্থানীয়), ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, পশুপালন, সংস্কৃতি, যুব উন্নয়ন, পরিবেশ ও সরকার কর্তৃক রক্ষিত নয় এমন বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, উপজাতীয় রীতিনীতি ও আইন, জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিও কার্যাবলী ইত্যাদি আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়।

বলাবাহুল্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল। প্রাক-উপনিবেশিক আমলে এ অঞ্চলের জুম্ম জনগণ সামন্ত রাজার অধীনে স্বাধীন সার্বভৌমত্বের অধিকারী ছিল। ১৮৬০ সালে এ অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্ত র্ভুক্ত হওয়ার পর ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি প্রণয়ন করে ব্রিটিশ সরকার জুম্ম জনগণের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখে। পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকারও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি বলবৎ রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখে। ১৯৬২ সালে ঘোষিত পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধানেও ‘উপজাতীয় অঞ্চল’ শব্দ ব্যবহার করে বিশেষ অঞ্চলের স্বীকৃতি দেয়া হয়।

স্বাধীন রাজার আমলে পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণ সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-নিপীড়নে নিষ্পেষিত হয়। বৃটিশের শাসনামলে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ যুক্ত হয়ে জুম্ম জনমানুষের জীবন সঙ্গীন হয়ে উঠে। পাকিস্তান শাসনামলে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের শাসন-শোষণের শিকার হয়। আর অধুনা বাংলাদেশের শাসনামলে উগ্র জাতীয়তাবাদ, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও জাতি-বিদ্বেষী নীতির ফলে জুম্ম জনগোষ্ঠী বিলুপ্তির পথে ধাবিত হতে বাধ্য হচ্ছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জুম্ম জনগণের উপর বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য ও বঞ্চনা অবসানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও স্বাতন্ত্র নৃতাত্তিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে তৎকালীন সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুলে ধরেন। কিন্তু জাতিরাষ্ট্রের উগ্র জাতীয়তাবাদে অন্ধ তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণের সেই দাবী সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। জুম্ম জনগণের ন্যায্য দাবী আদায়ের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। এমনি অবস্থায় সরকারও দমন-পীড়নের চরমপন্থা অবলম্বন করে। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ হলে জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সশস্ত্র রূপ ধারন করে।

প্রায় আড়াই দশক ধরে সশস্ত্র আন্দোলন অব্যাহত থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বরাবরই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে ও শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের পথ খোলা রাখে। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৫ সালে জেনারেল এরশাদ সরকারের সাথে আনুষ্ঠানিক সংলাপ শুরু হয়। জেনারেল এরশাদ সরকার ও পরবর্তী খালেদা জিয়া নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের সাথে সংলাপ প্রক্রিয়া ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকারের সাথে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

তৎকালীন শেখ হাসিনা সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কিছু বিষয় বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপন, ভারত থেকে জুম্ম

শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্যতম। কিন্তু দু:খজনক যে, চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো- যেগুলোর উপর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি করে ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন কার্যকর করে অত্রাঞ্চালে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করার মতো মৌলিক বিষয়গুলো বাস্ত বায়নে তৎকালীন সরকার এগিয়ে আসেনি। এক্ষেত্রে সংকীর্ণ ও অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবোধ প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করে। সরকারের অভ্যন্তরে ও ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের মধ্যে ছিল এ রকমের একটি শক্তিশালী কায়েমী গোষ্ঠী সক্রিয়- যারা প্রতি পদে পদে চুক্তি বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে।

বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণীত হলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়নি, ফলে বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকর হয়নি; সশস্ত্রবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়নি, পক্ষান্তরে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে একপ্রকার সেনা শাসন জারী করা হয়; ভূমি কমিশন গঠিত হলেও ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি হয়নি এবং চুক্তির সাথে বিরোধাত্মকভাবে ভূমি কমিশন আইন প্রণয়ন করা হয়; ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা হয়নি, পক্ষান্তরে চুক্তিকে লঙ্ঘন করে সেটেলার বাঙালীদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়; কেবলমাত্র সার্কেল চীফের মাধ্যমে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান বিধান কার্যকর করা হয়নি, পক্ষান্তরে চুক্তি লঙ্ঘন করে জেলা প্রশাসককে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়; অস্থানীয়দের নিকট দেয়া ভূমি লীজ বাতিল করা হয়নি, পক্ষান্তরে চুক্তি লঙ্ঘন করে নতুন লীজ প্রদান করা হয়; স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোটার তালিকা প্রণীত হয়নি, পক্ষান্তরে বহিরাগতদেরও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়; পার্বত্যাঞ্চলের সকল চাকুরীতে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করার বিধান কার্যকর হয়নি ইত্যাদি বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে চুক্তি বিরোধীতাকারী ও চরম দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার। আশা করার কোন অবকাশ ছিল না যে, চুক্তি বিরোধীতাকারী রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন হওয়ার পর চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে। স্বভাবতই এ সরকার চুক্তিকে নানাভাবে পদদলিত করার পথে অগ্রসর হয়। এ সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র জোরদার হয়ে উঠে। সিভিল ও সামরিক প্রশাসনসহ রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল শক্তি চুক্তি-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোকে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। শ্বেত সন্ত্রাস, উগ্র সাম্পদায়িকতা ও উগ্র ধর্মীয় জঙ্গিবাদ সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলকে ছেয়ে ফেলে। ২০০৩ সালে মহালছড়িতে জুম্ম জনগণের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার মতো অর্ধ-ডজন বর্বরোচিত ও সন্ত্রাসী ঘটনা সংঘটিত হয়। বর্তমানে দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত তৎকালীন বিএনপি দলীয় এমপি আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নেতৃত্বে গঠিত তথাকথিত 'সমঅধিকার আন্দোলন' নামে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তবাদী সংগঠন এবং চুক্তি বিরোধীতাকারী 'ইউপিডিএফ' নামধারী সন্ত্রাসী সংগঠনকে উলঙ্গভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হয়। জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের মর্যাদাকে পদদলিত করে বহিরাগতদের বসতি প্রদান ও বসতিকারী বাঙ্গালী কর্তৃক জুম্মদের ভূমি জবরদখল প্রক্রিয়া জোরদার হয়ে উঠে। সকল ক্ষেত্রে দলীয়করণের মাধ্যমে দুর্নীতি, অপশাসন, দুর্বৃত্তায়ন প্রবল হয়ে উঠে। সরকারী বাহিনীর কর্তৃত্ব, ধর-পাকড়, নিপীড়ন-নির্যাতনের ফলে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল অঘোষিত বিশাল কারাগারে পরিণত হয়।

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারী দেশে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় আসার পর এ সরকার দেশের গণতন্ত্র বিকাশে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বহুল আলোচিত দুর্নীতি বিরোধী অভিযানসহ অনেক জনগুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ সরকার কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে জরুরী অবস্থার বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও ভূমি অধিকার আদায়ে সোচ্চার এমনসব আদিবাসী নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার কিংবা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের, সেটেলার বসতি সম্প্রসারণ ও ভূমি জবরদখল জোরদারকরণ, সর্বোপরি সামরিক-বেসামরিক প্রশসানের মদদে সাম্প্রদায়িক কার্যক্রম জোরদার হয়ে উঠে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে সরকার ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি'কে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান, আগের রাজনৈতিক সরকারগুলোর মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে পদদলিত করে ২০০৭-২০০৮ প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় অস্থানীয় ও বহিরাগত বাঙালীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক যে, গত ২৯ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে মহাজোট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে। আওয়ামীলীগ তার নির্বাচনী ইসতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে। অবশ্য ক্ষমতায় আসার পর বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখনো কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পার্বত্যাবাসীর প্রত্যাশা যে, নির্বাচনী অঙ্গীকার মোতাবেক বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত মৌলিক বিষয়গুলো অগ্রাধিকার দিয়ে অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে। নিম্নে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কতিপয় প্রস্তাব উত্থাপন করা গেল-

মূল বিষয়	সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সমূহ
প্রথম অংশ : (২০০৯ সালের এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে)	
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন	১. যথাশীঘ্র প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন করা। ২. উক্ত কমিটির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে চুক্তি বাস্তবায়নের পূর্ণাঙ্গ রোডম্যাপ প্রণয়ন করা।
দ্বিতীয় অংশ : (এপ্রিল ২০০৯ থেকে শুরু করে ডিসেম্বর ২০১০ সালের মধ্যে)	
১. পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ	১. পার্বত্য চট্টগ্রাম বহিরাগত অনুপ্রবেশ বন্ধ করার সংবিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করা। ২. সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্মদের ভূমি জবরদখল করার চলমান প্রক্রিয়া বন্ধ করা এবং জরবদখলকৃত জমি জুম্মদের নিকট ফেরত দেয়া। ৩. সেটেলার বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইবে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা; এলক্ষ্যে- (ক) সেটেলার বাঙালীদের রেশন প্রদানের ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসিত অঞ্চলে রেশন প্রদানসহ পুনর্বাসন প্যাকেজ প্রবর্তন করা। (খ) সেটেলার বাঙালীদের গুচ্ছগ্রাম ভেঙ্গে দেয়া। (গ) ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক প্রস্তাবিত সাহায্যসহ বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিস সাহায্য গ্রহণ করা। ৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে কেবলমাত্র সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের বিধান রয়েছে। কিন্তু উক্ত বিধানকে লঙ্ঘন করে তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসকরাও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন মর্মে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০০০-এর অফিস আদেশ জারী করা হয়। উক্ত অফিস আদেশ প্রত্যাহার করা এবং পার্বত্য চুক্তি ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুসারে সার্কেল চীফদের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের বিধান বজায় রাখা। ৫. সেটেলার বাঙালীদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ বাতিল করা। ৬. সেটেলার এবং চাকুরী ও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বসবাসকারী বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করা। ৭. পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনরূপ ভূমি হস্তান্তর, অধিগ্রহণ ও ইজারা প্রদান না করা। ৮. পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক জেলার জন্ম-মৃত্যুর পরিসংখ্যান যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া।
২. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ	নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অচিরেই বাস্তবায়ন করা- ১. আঞ্চলিক পরিষদ আইন যথাযথভাবে কার্যকর করা। ২. আঞ্চলিক পরিষদের কার্যবিধিমালা চূড়ান্ত করা। ৩. আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা কার্যকর করা। ৪. আঞ্চলিক পরিষদ সদস্যদের মর্যাদা নির্ধারণ করা। ৫. আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স প্রকল্প বাস্তবায়ন করা (জমি অধিগ্রহণ ও অর্থ বরাদ্দ পূর্বক)। ৬. ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভবন নির্মাণের জন্য জমি ও অর্থ বরাদ্দ করা। ৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের হস্তে অর্পণ করা। ৮. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের উপর আঞ্চলিক পরিষদের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধানের বিধান রয়েছে। কিন্তু তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার, পার্বত্য

	চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং তিন পার্বত্য জেলা ও থানা পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। তাই আঞ্চলিক পরিষদের সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম কার্যকর করার প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩. পার্বত্য জেলা পরিষদ	১. পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুমোদন করা। ২. বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য জেলা পরিষদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য জেলা পরিষদে বিষয় হস্তান্তর না করে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক কার্যাদেশের মাধ্যমে সকল স্তরের প্রতিষ্ঠান, জনবল, কর্মসহ পূর্ণাঙ্গ বিষয় হস্তান্তর করা। ৩. পার্বত্য জেলা পরিষদে পার্বত্য চুক্তি অনুসারে হস্তান্তরযোগ্য ৩৩টি বিষয়ের মধ্যে (যাতে ৬৮টি কর্ম রয়েছে) এযাবৎ মাত্র ১২টি বিষয়/বিভাগ/সংস্থা/কর্ম হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট জেলার আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ (স্থানীয়), ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, মাতৃভাষায় শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা, পরিবেশ, যুব উন্নয়ন, স্থানীয় পর্যটন ইত্যাদিসহ অন্যান্য সকল বিষয় পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা। ৪. পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য- (ক) চেয়ারম্যান-সদস্যদের নির্বাচন বিধিমালা প্রণয়ন করা। (খ) ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়ন করে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে তিন পার্বত্য জেলার ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা। (গ) আইন অনুযায়ী নির্বাচনী এলাকা ভাগ করা ও সীমানা নির্ধারণ করা। ৫. পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।
৪. সকল অস্থায়ী ক্যাম্প ও অপারেশন উত্তরণ প্রত্যাহার	১. অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা, যা মে'০৯ মাস থেকে প্রত্যাহার শুরু করা। ২. ২০১১ সালের মধ্যে সকল ক্যাম্প প্রত্যাহার সমাপ্ত করা। ৩. অনতিবিলম্বে অপারেশন উত্তরন প্রত্যাহার করা। ৪. অনতিবিলম্বে সেনাবাহিনীর 'শান্তকরণ প্রকল্প' বন্ধ/বাতিল করা। ৫. প্রত্যাহৃত ক্যাম্পের পরিত্যক্ত জায়গা-জমি মূল মালিকদের নিকট হস্তান্তর করা। ৬. পার্বত্য জেলাগুলোর আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্তবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে অনতিবিলম্বে পাহাড়ী পুলিশ কর্মকর্তা ও কনষ্টেবলদের তিন পার্বত্য জেলায় বদলি করে পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে মিশ্র পুলিশ বাহিনী গঠন করা।
৫. ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি	১. অনতিবিলম্বে ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় ও আঞ্চলিক পরিষদের মধ্যে সভা আহ্বান করা। ২. অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি কমিশন আইন সংশোধন করা। ৩. অচিরেই ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা। ৪. অনতিবিলম্বে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কাজ শুরু করা।
৬. প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী পুনর্বাসন	১. জুম্ম শরণার্থীদের ৪০টি গ্রাম সেটেলার বাঙালীদের জবরদখল হতে মুক্ত করা। ২. প্রত্যাগত ৯,৩২৬ শরণার্থী পরিবারকে তাদের জমিজমা ফেরৎ দেয়া। ৩. পুনর্বহালকৃত শরণার্থীদের (১৯৬ জন) অনুপস্থিতিকালীন সময়কে কোয়ালিফাইং সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা, জ্যেষ্ঠতা প্রদান, বেতন স্কেল নিয়মিত করা ও সংশ্লিষ্ট ভাতাদি প্রদান বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ৪. প্রত্যাগত শরণার্থীদের ব্যাংক ঋণ মওকুফ করা।
৭. আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন	১. টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা। ২. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বিধান রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে সেটেলার বাঙালীদেরও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রাম পুনর্বাসনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ কর্তৃক ১৯-০৭-১৯৯৮ তারিখে প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কাজেই পার্বত্য চুক্তিকে

	লঙ্ঘন করে প্রেরিত উক্ত পত্র প্রত্যাহার করা।
৮. রাবার চাষ ও অন্যান্য খাতে প্রদত্ত জমির লীজ বাতিলকরণ	১. রাবার চাষ ও অন্যান্য খাতে অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত জমির লীজ বাতিল করা। ২. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরে প্রদত্ত অবৈধ লীজও বাতিল করা।
৯. পার্বত্যাঞ্চলের চাকুরীতে নিয়োগ	১. পার্বত্যাঞ্চলের সকল চাকুরীতে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করার বিধান কার্যকর করা।
১০. পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসন	১. পূর্বতন চাকুরীতে পুনর্বহালকৃত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের অনুপস্থিতিকালীন সময়কে কোয়ালিফাইং সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা, জ্যেষ্ঠতা প্রদান, বেতন স্কেল নিয়মিত করা ও সংশ্লিষ্ট ভাতাদি প্রদান বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া। ২. জনসংহতি সমিতি সদস্যদের দাখিলকৃত ১৪২৯টি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা। ৩. জনসংহতি সমিতির ৪ জন সদস্যের মোট ২২,৭৮৩ টাকার ব্যাংক ঋণ মওকুফ করা।
১১. মামলা প্রত্যাহার	১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও স্থায়ী বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে পার্বত্য চুক্তির পূর্বে রুজুকৃত মামলাগুলোর মধ্যে সরকারীভাবে গঠিত তিন পার্বত্য জেলার মামলা প্রত্যাহার কমিটি কর্তৃক ৭২০টি মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত মামলাগুলো প্রত্যাহার সংক্রান্ত কোন গেজেট অদ্যাবধি প্রকাশ করা হয়নি। অবিলম্বে তা প্রকাশের ব্যবস্থা করা। ২. জনসংহতি সমিতি ও স্থায়ী বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে বিগত চারদলীয় জোট সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দায়েরকৃত ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলাগুলো সরকার কর্তৃক গঠিত রিভিউ কমিটির মাধ্যমে প্রত্যাহার করা।
১২. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কর্তৃক কার্যকর ভূমিকা রাখা। ২. মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে পাহাড়ীদের অগ্রাধিকার দিয়ে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা। ৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির উদ্যোগেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পূর্ণাঙ্গ রোডম্যাপ প্রণয়ন করা।
তৃতীয় অংশ : (২০০৯-২০১০ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করা)	
১. সাংবিধানিক স্বীকৃতি	১. সংবিধান সংশোধন পূর্বক ৪৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তা, ভাষা ও সংস্কৃতিসহ সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। ২. আইএলও-এর ১০৭ ও ১৬৯ নং কনভেনশন ও ২০০৭ সালে গৃহীত জাতিসংঘের আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র মোতাবেক আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।
২. আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত	১. আদিবাসী ও উপজাতি বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ অনুস্বাক্ষর করার উদ্যোগ নেয়া। ২. জাতীয় পর্যায়ের সেক্টোরাল পলিসিগুলোতে আদিবাসী প্রেক্ষাপট সন্নিবেশকরণ পূর্বক সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া। ৩. বাংলাদেশ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার (BPATC), ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (NDC), বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী, জুডিসিয়াল সার্ভিস ও পুলিশ সার্ভিস প্রশিক্ষণমালায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থাসহ আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা। ৪. পার্বত্যাঞ্চলের ৩টি সংসদীয় আসনসহ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে সারাদেশের আদিবাসীদের জন্য জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার পরিষদে আসন সংরক্ষণ করা।
৩. পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য আইন সংশোধন	১. পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য সকল আইন ও বিধিসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী সংশোধন করা। ২. এক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেগুলেটারী কমিশনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যকর উদ্যোগ নেয়া।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেকগুলো শক্তি বাধা হিসেবে দন্ডায়মান। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল- সরকারের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার অভাব। চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিগত রাজনৈতিক সরকারগুলোর মধ্যে চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা দেখা যায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সরকারীভাবে যে দায়িত্ব-কর্তব্য পালিত হয়েছে সেখানে স্তরে স্তরে দেখা যায় নানা ধরনের বাধা ও সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ও আমলাতন্ত্রের অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি চুক্তি বাস্তবায়নে অন্যতম বাধা হিসেবে কাজ করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় আরো একটি অন্যতম বাধা হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলে নিয়োজিত সেনাবাহিনী ও তিন পার্বত্য জেলায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের চুক্তি বিরোধী ভূমিকা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হোক তা তারা চান না। পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো 'অপারেশন উত্তরণ' নামে এক প্রকার সেনা কর্তৃত্ব রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর একটি অংশ চুক্তির পক্ষে থাকলেও প্রভাবশালী অংশটি চুক্তির বিপক্ষে সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠী পাহাড়ী-বাঙালীর যে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ধারা গ্রহণ করে, সেই রাজনৈতিক ধারার সাথে একাত্ম হয়ে তারা চুক্তি বিরোধী ভূমিকা পালন করে থাকেন এবং এই কারণে দেখা যায় তারা সকল ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে চলেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সংগঠনও পঞ্চমবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে চুক্তি বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে।

চুক্তি বাস্তবায়নে তৃতীয় অন্যতম বাধা হচ্ছে- মৌলবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন। সেই মৌলবাদী সংগঠনগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যাতে বাস্তবায়িত হতে না পারে সেজন্য সেটেলারদের মদদ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সাম্প্রদায়িকতামূলক ও উগ্র জাতীয়তামূলক অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করা, পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ী-বাঙালী স্থায়ী অধিবাসীদের বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের জীবন-জীবিকার উপর আঘাত হানা, সর্বোপরি ভূমি জবরদখল করে জুম্মদের জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্নকরণের বর্ণবাদী তৎপরতা চালিয়ে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাও ইতিবাচক নয়। এই মন্ত্রণালয় যতটুকু ভূমিকা রেখেছে তা অধিকাংশই চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিরোধী।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এসব বাধাগুলো অপসারণ করা না হলে চুক্তি পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না। তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন যত দেরী হবে, ততই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সামগ্রিকভাবে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠতে পারে।